গল্প লহরী পর্য্যায়—১

শ্রীরামকৃষ্ণ-গল্পলহরী

দাম পাঁচ আনা

শ্রীরামকৃষ্ণ-গল্পলহরী।

প্রথম ভাগ।

কলমা রামকৃষ্ণ-সেবাসমিতির
সেবকগণ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রকাশক

দাশ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
৬নং, কালিদাস সিংহের লেন, কলিকাতা।
মাঘ, ১৩২৮

মূল্য ।/০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণ-সেবাসমিতি

পোঃ কলমা, ঢাকা।

(২) সেনগুপ্ত এণ্ড কোং

৫নং, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

ও

অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

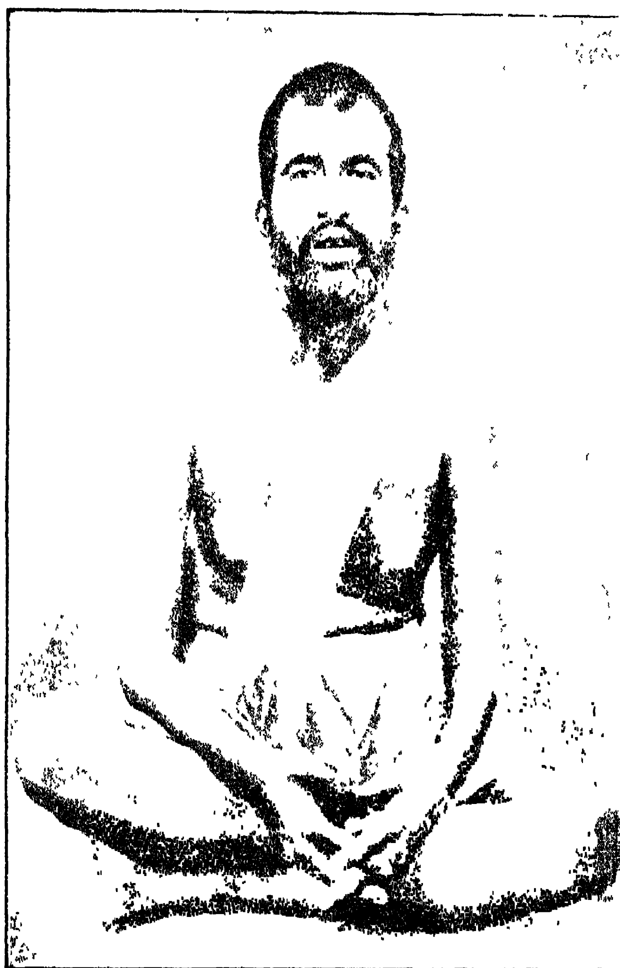
এই পুস্তকের লভ্যাংশ কলমা রামকৃষ্ণ-সেবাসমিতির সাহায্য-কল্পে ব্যয়িত হইবে।

ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

২৯নং, কালিদাস সিংহের লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

জগতের ধর্ম্মগুরুদের প্রীত্যর্থে
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রিয়
সরলমতি
শিশু-নারায়ণদের
পূজায়
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইল।



শ্রীরামকৃষ্ণ গল্পলহরী।

সিংহ-শাবক।

এক বনের ধারে কতকগুলি ভেড়া ঘাস খাইত। সে-বনে এক সিংহী বাস করিত; সে মাঝে-মাঝে ভেড়ার পালে পড়িয়া ভেড়া মারিয়া খাইত। তাহার উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভেড়ার রক্ষক একদিন কয়েকজন শিকারী আনিয়া সিংহীটাকে মারিয়া ফেলিল। সিংহীর ছোট একটী ছানা ছিল। ভেড়ার রক্ষক তাহাকে ভেড়ার সঙ্গে বাড়ী নিয়া আসিল এবং ভেড়ার দুধ খাইয়া সে দিন-দিন বাড়িতে লাগিল। ভেড়ার দুধ খাইয়া এবং ভেড়ার সঙ্গে একত্র থাকিয়া তাহার স্বভাবও ভেড়ার মত হইয়া গেল। এক শরীরের গঠন ছাড়া ভেড়ার সহিত তাহার আর কোন পার্থক্য রহিল না। সে প্রত্যহ ভেড়ার সঙ্গে ঘাস খাইতে যাইত, ভেড়ার মতই ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করিয়া ডাকিত—মাংসের গন্ধও সে সহিতে পারিত না।

একদিন ঐ ভেড়ার পালে নূতন আর একটা সিংহ আসিয়া পড়িল। ভেড়ারা প্রাণের ভয়ে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করিতে-করিতে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। সিংহের ছানাটাও উহাদের মত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ শব্দ করিতে-করিতে ছুটিল। সিংহের ছানাকে ভেড়ার সহিত ঘাস খাইতে দেখিয়া এবং ভেড়ার মত ভ্যাঁ ভ্যাঁ শব্দ করিতে শুনিয়া সিংহ ভারী আশ্চর্য্য হইয়া গেল; সে সব ভেড়া ছাড়িয়া দিয়া উহাকেই গিয়া ধরিল। সিংহের ছানা তো ভয়ে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করিয়া চীৎকার করিয়াই অস্থির। সিংহ তাহাকে বলিল,—"ওরে, তুই আমার জাত হয়ে ভেড়ার সঙ্গে একত্র ঘাস খাচ্ছিস্ আর ভেড়ার মত ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে' চেঁচাচ্ছিস্ কেন বল্ তো? তুই হলি সিংহ—পশুর রাজা; ভেড়া তো তোর খাবার জিনিস।" সিংহের ছানা তো সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চায় না—ভয়ে আরো জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সিংহ তাহাকে জোর করিয়া এক ঝরণার ধারে টানিয়া লইয়া গেল। তার পর বলিল,—"এখন জলের দিকে চেয়ে দেখ্ তোর চেহারা আর আমার চেহারা ঠিক একরকম কিনা।" সিংহের ছানা চাহিয়া দেখিল, হাঁ ঠিকই তো! সিংহ তাড়াতাড়ি কতকগুলি মাংসের টুক্‌রা আনিয়া তাহার মুখে

গুঁজিয়া দিল। সিংহ-শাবকের ভেড়ার স্বভাব দূর হইয়া গেল; সে সিংহের মত লাফ দিয়া বনে চলিয়া গেল।

মানুষ নিজেকে চিনিতে পারে না বলিয়াই মনে করে সে অক্ষম। যখন চিনে, তখন দেখে যে তাহার মধ্যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে।

যেই গোপাল সেই কালী।

দুই ভাই ছিল। বড় ভাই মা-কালীর ভক্ত, ছোট ভাই গোপালজীউর ভক্ত। দু'জনেই যার-যার ইষ্টদেবকে ভিন্ন-ভিন্ন মন্দিরে খুব নিষ্ঠার সহিত ভজনা করিত।

তাহাদের একটি বাগান ছিল। বাগানে একটি কলা গাছে এক কাঁদি কলা হইয়াছিল। ছোট ভাই ভাবিল—"কলা পাকলে ও-দিয়ে গোপালজির সেবা হবে।" বড় ভাই ভাবিল—"ও-কলা আমি মা-কালীকে নিবেদন করবো।"

কলা যখন পাকে, ছোট ভাই তখন বাড়ী ছিল না। বড় ভাই কলার কাঁদিটী কাটিয়া আনিয়া মা-কালীকে নিবেদন করিল। পরদিন ছোট ভাই বাড়ী আসিয়া দেখে, বাগানে সে-কলা নাই। ব্যস্ত হইয়া গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ গা, বাগানে যে কলা ছিল তা কে নিলে?" গিন্নী উত্তর করিল—"তা' তোমার দাদা কেটে এনে মা-কালীর সেবায় লাগিয়েছেন।" ছোট ভাই তো একথা শুনিয়া রাগে আত্মহারা—"কী, আমি আমার গোপাল্-জীকে দোব বলে' ও-কলা রেখেছি, উনি কিনা সে-কলা

ওঁর কালীকে দিলেন! এত বড় কথা! আচ্ছা, র'সো, মজা দেখাচ্ছি, মা-কালীকে আর কলা খেতে হবে না।"

এই কথা বলিয়া সে লাঠি হাতে মা-কালীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে গেল। লাঠি তুলিয়া মারিবে, এমন সময়ে মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া হাত আর চলে না—আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এ তো মা-কালীর মূর্ত্তি নয়, এ যে আমার গোপালজীর মূর্ত্তি! ভাগ্যিস্ লাঠি মারা হয়নি। নইলে কী সর্ব্বনাশটাই হয়েছিল—আহা, তা' হ'লে যে আমার গোপালজীর প্রতিমা ভেঙ্গে চূরমার হ'য়ে যেত! আচ্ছা, এ মন্দিরে গোপালজী এল কোত্থেকে? একি তবে গোপালজীর মন্দির? আমার কি ভুল হলো?—দেখিতো ও-মন্দিরে গিয়ে।" এরূপ ভাবিয়া অন্য মন্দিরে গিয়া দেখে সেখানেও গোপালজীর মূর্ত্তি! সর্ব্বত্রই যে গোপাল! তখন তার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল, বুঝিতে পারিল—যেই গোপাল সেই কালী।

অন্য ধর্ম্মের দ্বেষ করিতে নাই। খুব নিষ্ঠার সহিত নিজ-নিজ ইষ্ট সাধনা করিলে শেষে বুঝা যায়, যে, সবই এক—যেই হরি, সেই আল্লা, সেই কালী, সেই গড্।

"চাপরাস চাই"।

এক দেশে একটী পুকুর ছিল, তার নাম "হালদার পুকুর"। গ্রামের লোকে ভাল জলের অভাবে কষ্ট পায় দেখিয়া সরকার বাহাদুর ঐ পুকুরটা কাটাইয়া দেন। এখান হইতে লোকে শুধু খাওয়ার জল নিয়া যাইত। পুকুরে নামিয়া স্নান করা, কাপড় কাচা, বা অন্য কোনও রূপে অপরিস্কার কেহ করিতে পারিত না।

কতকগুলি খারাপ লোক কিন্তু খুব ভোরে উঠিয়া ঐ পুকুরের পাড়ে যাইয়া বাহ্য করিয়া রাখিত। লোকে জল লইতে আসিয়া দেখিত ব্যাপার ভয়ানক!—কারো পা ফেলিবার যায়গা নাই! তখন তাহারা রাগিয়া, যাহারা একাজ করিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্যে গালাগালি করিত। কিন্তু পরদিন আবার যেই সেই।—বাহ্য আর থামে না। তখন লোকে সরকার বাহাদুরকে এ বিষয় জানাইল। খবর পাইয়া সরকার একজন চাপরাসীকে সেখানে পাঠাইয়া দিল। চাপরাসী যাইয়া খুব হাঁক-ডাক করিয়া শাসাইয়া গেল—এবং পুকুর পাড়ে একটা গাছে একখানা কাগজ মারিয়া দিল—"বাহ্য করিও না"। ব্যস, তারপর দিন

হইতে বাহ্য একেবারে বন্ধ ! কারণ সকলেই জানে—বাবা, এ যার-তার কথা নয়, সরকারের চাপরাসী বলিয়া গিয়াছে।

সরকার যাহাকে চাপরাস দেন লোকে তার কথাই শোনে ; তেমনি ভগবান যাঁহাকে ক্ষমতা দেন লোকে তাঁর কথাই মানিয়া নেয়, অন্য লোকের কথায় কান দেয় না। লোককে উপদেশ দেওয়ার পূর্ব্বে ভগবানের আদেশ লাভ করিতে হয়—তবেই উপদেশে কাজ হয়।

জটিল বালক।

জটিল নামে একটি বালক ছিল। সে গ্রামের পাঠশালায় পড়িত। তাহার বাড়ী হইতে পাঠশালায় যাইতে হইলে একটা বনের পাশ দিয়া যাইতে হয়। জটিল ছেলে-মানুষ কিনা, তাই ঐ বনের ধার দিয়া যাইতে বড় ভয় পাইত।

একদিন সে পাঠশালা হইতে আসিয়া মাকে বলিল—"মা, পাঠশালায় যেতে' যে ঐ বনটা আছে, ওর পাশ দিয়ে যখন একলা যাই তখন বড্ড ভয় হয়।" মা বড় ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভয় কি, বাছা, ঐ বনের পাশে গিয়ে মধুসূদনকে ডাক্‌বি।" ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—"মধুসূদন কে মা? আমি তো তাকে দেখিনি, মা।" মা বলিলেন—"ওরে, মধুসূদন তোর দাদা হয়। ভয় পেলেই তাকে খুব ডাকিস্। তা হলেই সে দেখা দেবে।"

পরদিন পাঠশালায় যাইবার সময় জটিল বনের পাশে যাইতেই ভয় পাইয়া "দাদা মধুসূদন" "দাদা মধুসূদন" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু দেখে, কেউ কোথাও

নাই। জটিলের ভয় ইহাতে বাড়িয়া গেল। আবার কাঁদিতে-কাঁদিতে আরো জোরে ডাকিতে লাগিল—"কোথায় দাদা মধুসূদন, তুমি এসো, আমার বড্ড ভয় পেয়েছে। মা বলেছে ডাক্‌লে তুমি আস্‌বে, এত ডাক্‌ছি ভয়ে আমার কান্না পাচ্ছে, তবু তুমি এস না কেন ?"

মধুসূদন হরি এবার স্থির থাকিতে পারিলেন না। মানুষের রূপে আসিয়া বলিলেন—"এই যে আমি, ভয় কি তোর ?" এই বলিয়া তাকে সঙ্গে করিয়া পাঠশালায় দিয়া আসিলেন। আর বলিয়া দিলেন—'তোর কোন ভয় নেই, তুই যখনই ডাক্‌বি তখনই আমি আস্‌বো।"

বালকের মত সরল বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা যার আছে ভগবান তাকেই দেখা দেন।

বহুরূপী

একটা বড় বটগাছের তলায় একজন সাধু থাকিতেন। ঐ গাছের উপর একটি গিরগিটিও থাকিত। গিরগিটির গায়ের রং সব সময়ে একরকম থাকে না—কখনো লাল, কখনো নীল, কখনো সবুজ, কি অন্য কোনও রকম হয়। এজন্য গিরগিটিকে বহুরূপী বলে।

ঐ গাছ-তলায় অনেকে আবার বাহ্যে যাইত। একদিন একজন লোক ঐখানে পায়খানা সারিয়া আসিয়া সকলকে বলিতে লাগিল—"দেখ, ঐ গাছের উপরে একটি গিরগিটি আছে, তার গায়ের রং একেবারে টুক্‌টুকে লাল—যেন সিঁদুর।" ঐকথা শুনিয়া অন্য একজন বলিয়া উঠিল—"না হে, না, আমি তোমার অনেক আগেই ঐখানে বাহ্যে গিয়েছি। আমি ঠিক দেখে এসেছি, ঐ গিরগিটির গায়ের রং ঘাসের মত সবুজ।" আর একজন অমনি বলিয়া উঠিল—"তোমাদের দু'জনারই দেখার ভুল হয়েছে, কাল্‌কে আমি দেখে এসেছি, ও লালও নয় সবুজও নয়, ও ঠিক নীল—একেবারে আকাশের মত রং।" চতুর্থ ব্যক্তি বলিল—"আমরা বুঝি ঐ গিরগিটিটি দেখিনি?—

এই তো খানিকক্ষণ আগে আমি নিজ-চোখে দেখে এলুম —ওর রং একেবারে হলুদ।" তখন আর-একজন বলিল—"তোমরা কেউ ঠিক দেখনি, আমি ঠিক দেখেছি— ওর রং পাঁস্‌টে।" তখন গিরগিটির কি রং তাহা লইয়া উহাদের ভিতর মস্ত গোল বাঁধিয়া গেল। সবাই বলে— আমি যা দেখেছি তাই ঠিক, আর সব মিছে কথা।" মীমাংসা আর হয় না। বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইল। তখন একজন বলিল—"ঐ গাছতলায় যে সাধুটি থাকেন চল ওঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি।" সকলেই তাহাতে রাজী হইল; সাধুটির কাছে গিয়া তাহাদের ঝগড়ার বিষয় সব বলিল। সাধুটি বলিলেন—"আমি এ গাছ-তলাতেই থাকি, আর ঐ জানোয়ার চিরদিনই দেখে আস্‌ছি। তোমরা যে যা বলেছ সব-ই সত্য।" সকলে বলিল—"সেকি কথা!" সাধু বলিলেন—"হাঁ, তোমাদের সবার কথাই সত্য—ওর রং কখনো লাল, কখনো সবুজ, কখনো হল্‌দে, কখনো পাঁস্‌টে। আবার সময়-সময় আরো কত কি রং ধরে। আবার মাঝে-মাঝে দেখি কোন রং-ই নেই।"

ভগবান কি রকম তাহা লইয়া সকলে ঝগড়া করে— সকলেই বলে "আমি যা বলি তা-ই ঠিক।" কিন্তু যে

সর্ব্বদাই ধর্ম্ম-গাছের তলায় থাকে সে জানে যে ভগবানের রূপের অন্ত নাই, আবার কখনো-কখনো কোন রূপই থাকে না।

হাতী-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণ।

এক বনে এক সাধু ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল। তিনি একদিন তাঁহার শিষ্যদের উপদেশ দিলেন—"সকলের মধ্যেই নারায়ণ আছেন, এইটী জেনে সকলকে নমস্কার কর্‌বে।"

তারপর একদিন এক শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনিতে বনে গেল। এমন সময় দূরে একটা রব উঠিল—"পাগ্‌লা হাতী, পাগ্‌লা হাতী, কে কোথায় আছ পালাও।" বনের সকল লোকই পলাইল, কিন্তু শিষ্যটি কোথায়ও গেল না। সে মনে ভাবিল—"হাতীও যে নারায়ণ, তবে তাকে দেখে পালাব কেন?" ইহা ভাবিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল এবং হাতী আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া স্তব-স্তুতি আরম্ভ করিল। এদিকে মাহুত সাধুটিকে বার-বার চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—"কি কচ্ছো, শীগ্‌গির পালিয়ে যাও।" সাধু কিন্তু তথাপি নড়িল না। অবশেষে হাতী তাহাকে সম্মুখে পাইয়া শুঁড়ে করিয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিল। শিষ্য বিষম আঘাত পাইয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

সংবাদ পাইয়া তাহার গুরু ও গুরুভাইরা আসিয়া উপস্থিত। সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে আশ্রমে নিয়া আসিল। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হইলে একজন জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ হে, হাতী আস্‌ছে শুনেও তুমি পালিয়ে গেলেনা কেন?" সে উত্তর করিল—"গুরুদেব যে আমায় বলে' দিয়েছিলেন, যে নারায়ণই মানুষ, জীব, জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতীনারায়ণ আস্‌ছে দেখে সেখান থেকে সরে' যাই নি।" গুরু বলিলেন, "বাবা, হাতী-নারায়ণ আস্‌ছিলেন বটে, কিন্তু মাহুত-নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন; সবই নারায়ণ এ জ্ঞান যদি হ'য়ে থাকে, তবে মাহুত-নারায়ণের কথা শুন্‌লে না কেন? মাহুত-নারায়ণের কথাও শুন্‌তে হয়।"

সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত সকলের হৃদয়েই ভগবান আছেন। কিন্তু তাই বলিয়া অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না—মাখামাখি চলে না—শুধু নমস্কার করিয়াই তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে হয়।

ফোঁস্ কর্‌তে হয়।

একটা বড় মাঠে রাখালেরা গরু চরাইত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষধর সাপ ছিল। সেই সাপের ভয়ে রাখালেরা অস্থির। সকলেই অত্যন্ত সাবধানে থাকিত।

একদিন এক ব্রহ্মচারী সেই মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন। রাখালেরা দৌড়াইয়া গিয়া বলিল—"ঠাকুর মশাই, ওদিক্ দিয়ে যাবেন না, ওদিকে একটা ভয়ানক বিষধর সাপ আছে।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তা হোক্ বাবা, আমার তাতে ভয় নেই; আমি মন্ত্র জানি।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী সেইদিকে চলিয়া গেলেন; ভয়ে রাখালেরা কেহ তাঁহার সঙ্গে গেল না।

ব্রহ্মচারীকে দেখিয়াই সাপটা ফণা তুলিয়া দৌড়াইয়া আসিল। কিন্তু কাছে আসিতে-না-আসিতেই ব্রহ্মচারী যেই একটী মন্ত্র পড়িলেন, অমনি সাপটা কেঁচোর মত হইয়া পায়ের কাছে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী তখন তাকে বলিলেন, "ওরে, তুই পরের হিংসা করে' বেড়াস্ কেন বল দেখি? আয় যাতে ভগবানে ভক্তি হয় আমি তোকে

সেই মন্ত্র দিয়ে দি। এই মন্ত্র জপ্‌লে তোর আর হিংসা-ক্রোধ থাক্‌বে না।” এই বলিয়া তিনি সাপকে মন্ত্র দিলেন। সাপটা মন্ত্র পাইয়া গুরুকে প্রণাম করিল, আর জিজ্ঞাসা করিল—“ঠাকুর, কি করে সাধন কর্‌বো, বলুন।” গুরুদেব বলিলেন—“দিনরাত এই মন্ত্র জপ কর্‌বি, আর কাকেও কাম্‌ড়াবি না। আজ আমি চল্লুম, আবার এক বৎসর পরে আস্‌বো।”

এই রকমে কিছুদিন যায়। সাপ আর কাহাকেও হিংসা করে না, দিনরাত কেবল মন্ত্র জপ করে। রাখালেরা দেখিল যে সাপটা আর কামড়াইতে আসে না। ঢেলা মারিয়া দেখিল, তাতেও সাপের রাগ হয় না। লাঠি মারিয়া দেখিল তবুও সাপ কেঁচোর মত পড়িয়া থাকে। সুবিধা পাইয়া একদিন একটা দুষ্ট ছেলে তার ল্যাজ ধরিয়া খুব একচোট ঘুরপাক দিয়া দূরে আছড়াইয়া ফেলিল। সাপটার মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রাখালেরা মনে করিল সাপটা মরিয়াছে; তাই তাকে ফেলিয়া তারা চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হইল। তখন সে অতি কষ্টে আস্তে-আস্তে তার গর্ত্তের ভিতর চলিয়া গেল।

তার আর নড়িবার শক্তি ছিল না। অনেকদিন পরে সে একেবারে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেল। তখন দেহরক্ষার জন্য আহারের সন্ধানে রোজ রাত্রে বাহিরে আসিত। ভয়ে দিনের বেলা আসিত না। আর হিংসা ত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া মাটি, পাতা, ফল ইত্যাদি খাইত।

এক বৎসর পরে ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার ফিরিয়া আসিলেন ও রাখালদের কাছে সাপটার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাখালেরা বলিল, যে, সাপটা মরিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস হইল না, কারণ তিনি জানেন, যে, তাঁহার-দেওয়া মন্ত্রের সাধন না হইলে দেহত্যাগ হইবে না। ব্রহ্মচারী তখন তাঁহার-দেওয়া নাম ধরিয়া সাপকে ডাকিতে লাগিলেন। সাপ গুরুদেবের আওয়াজ শুনিয়া গর্ত্তের বাহিরে আসিল ও গুরুকে প্রণাম করিল। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন-- "কিরে, তুই কেমন আছিস্?" সাপ বলিল—"আজ্ঞে, ভালই আছি।" ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তা হ'লে তোর শরীর এমন রোগা হয়ে গেছে কেন?" সাপ বলিল— "এখন আর হিংসা করি না; পাতাটা, ফলটা খাই, তাই বোধ হয় রোগা হয়ে গেছি।" একবৎসর মন্ত্র জপ করায় সাপের সত্বগুণ হইয়াছে—এখন আর কাহারও উপর

ক্রোধ নাই তাই। সে ভুলিয়া গিয়াছে, যে, রাখালদের অত্যাচারে তার এমন দশা। গুরু কিন্তু বলিলেন—“না রে, শুধু না-খেয়ে এমন হয় না, অবশ্যই আরও কারণ আছে। তুই ভেবে ছাখ।” ভাবিতে-ভাবিতে সাপটার তখন রাখালদের মারপিটের কথা মনে পড়িল এবং গুরুকে সব কথা জানাইয়া বলিল—“রাখালদেরই বা দোষ কি? তারা যে অজ্ঞান, তারা তো আর জানে না যে আমি হিংসা ছেড়েছি, আর কাউকে কামড়াব না।” ব্রহ্মচারী বলিলেন—“ছিঃ, তুই এমন বোকা, আত্মরক্ষা করতে জানিস্ নে! আমি কামড়াতেই বারণ করেছি, ফোঁস্ করতে তো বারণ করিনি। ফোঁস্ করতে হয়—ভয় দেখাতে হয়।”

দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস্ করিতে হয়—ভয় দেখাইতে হয়, পাছে সে অনিষ্ট করে। তবে, গায়ে বিষ ঢালিয়া দিতে নাই- ফিরিয়া কোনও অনিষ্ট করিতে নাই।

যেমনি ভাব তেমনি লাভ।

দুই বন্ধু ছিল। তাহাদের মধ্যে বড় ভাব। এক সঙ্গে থাকে, এক সঙ্গে বেড়ায়। একদিন তারা আমোদ করিতে বাহির হইল। পথে যাইতে-যাইতে দেখিল, একজায়গায় ভাগবত পাঠ হইতেছে। একজন বলিল,—"এসো ভাই, একটু ভাগবত শুনা যাক।" ইহা বলিয়া সে সেই জায়গায় বসিয়া পড়িল। অপরটি একটু উঁকি মারিয়া দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল এবং এক মদের আড্ডায় বসিয়া আমোদ করিতে লাগিল।

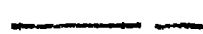
খানিকক্ষণ পরে দুই বন্ধুর মনেই বিরক্তি আসিল। যে ভাগবতপাঠ শুনিতেছিল, সে ভাবিল, "এখানে বসে' থেকে কী ঠকাটাই ঠকেছি। গোঁসাইজী বিড়্‌বিড়্ করে' কি বক্‌ছে—কিচ্ছু ভাল লাগ্‌ছে না। আহা, আমার বন্ধুটি না-জানি কোথায় গিয়ে কত আমোদই কচ্ছে, কত ইয়ার জুটেছে। কত গান, কত বাজনা, কত ঠাট্টা-তামসায় বন্ধু-আমার মস্‌গুল হয়ে আছে!"

এদিকে যে মদের আড্ডায় ঢুকিয়াছিল, সে ভাবিতে লাগিল—"ছি-ছি, ধিক্ আমাকে! আমি কি ছাই

নরকে পড়ে' আছি। আমার বন্ধুটির কী সুন্দর স্বভাব, সে এসব হীন আমোদের লোভ ছেড়ে কত হরি-কথা শুন্‌ছে। তার প্রাণে এখন কত শান্তি, কত আনন্দ! ভগবানের পবিত্র গুণগান শুনে' তার প্রাণ কেমন পবিত্র হয়ে যাচ্ছে!"

কিছুদিন পরে এমন হইল, যে দুই জনেই এক সময়ে মরিল। তারপর যে ভাগবত শুনিতেছিল, তাকে যমদূত নরকে লইয়া গেল, আর যে মদের আড্ডায় পড়িয়াছিল তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। ভগবান ভাবগ্রাহী। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়িয়া আছে, তিনি সেসব দেখেন না তিনি দেখেন লোকের মন, সেটি সৎবিষয়ে না অসৎবিষয়ে মজিয়া আছে।



দুই চাষা।

এক সময় দেশে অনেকদিন ধরিয়া বৃষ্টি আর হয় না। চাষাদের চিন্তার অন্ত নাই; বৃষ্টি না হইলে শস্য যে মোটেই জন্মিবে না—কি খাইয়া সারাটা বৎসর কাটাইবে? এক একগুঁয়ে চাষা রাত্রে শুইয়া-শুইয়া ঠিক করিল, পরদিন খাল কাটিয়া নদী হইতে জল আনিয়া শস্য বাঁচাইবে।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে কোমরে একখানা গামছা বাঁধিয়া, একখানা কোদালি হাতে লইয়া, ক্ষেতের দিকে গেল এবং আপন মনে খাল কাটিতে লাগিল।

এদিকে স্নান করিবার বেলা হইল। চাষার স্ত্রী মেয়েকে দিয়া তেল পাঠাইয়া দিল। মেয়ে চাষার কাছে যাইয়া বলিল,—"বাবা, বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।" চাষা বলিল,—"তুই যা দেখ্‌ছিস্ না আমি এখন কাজ কর্‌ছি?"

বেলা দুপুর ছাড়াইয়া গেল, তখনও চাষা মাঠে কাজ করিতেছে, স্নান করিবার নামটি নাই। এত বেলাতেও সে আসেনা দেখিয়া চাষার স্ত্রী নিজেই গিয়া ক্ষেতে

উপস্থিত হইল। যাইয়া দেখে চাষা তখনও মাটি খুঁড়িতেছে। সে তখন বলিল,—"তুমি এখনো চান কচ্ছো না! ভাত যে জুড়িয়ে গেল খাবে কখন? তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি—না হয় কাল কর্‌বে, কি খেয়েদেয়েই কর্‌বে।" শুনিয়াইত চাষা রাগিয়া আগুন! গালাগালি দিয়া কোদালী লইয়া তাহাকে তাড়া করিল, আর বলিল,—"তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নি, চাষবাস কিচ্ছু হ'ল না, ছেলেপুলে খাবে কি? না খেয়ে সব মারা যাবি? আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আন্‌ব, তবে নাওয়া-খাওয়া।" স্ত্রী বেগতিক দেখিয়া দৌড়াইয়া পালাইয়া গেল।

সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া চাষা সন্ধ্যাবেলা নদীর সঙ্গে খালের যোগ করিয়া দিল। তখন খাল দিয়া কুল্‌কুল্‌ করিয়া জল মাঠে যাইতে লাগিল, চাষার মনে আর আনন্দ ধরে না! সে তখন খোসমেজাজ নিয়া বাড়ী ফিরিল এবং স্ত্রীকে বলিল,—"নেঃ, এখন তেল নিয়ে আয়।" তারপর তামাক খাইয়া স্নান-আহার করিয়া নিশ্চিন্ত মনে মহাসুখে ভোঁস্-ভোঁস্ করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল।

আর একজন চাষা, সেও বৃষ্টি শীঘ্র হইবার কোন

সম্ভাবনা না দেখিয়া অগত্যা খাল কাটিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু দুপুর হইতে-না-হইতেই তার স্ত্রী যখন আসিয়া বলিল,—"অনেক বেলা হয়েছে, এখন খাবে-দাবে এস, একেবারে অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।" তখন সে কোদালী রাখিয়া দিয়া বলিল,—"আচ্ছা, তুই যখন বল্‌ছিস্ তা' চল্!" তার আর মাঠে জল আনা হইল না।

প্রথম চাষার রোক্ ছিল, তাই মাঠে জল আসিল। দ্বিতীয় চাষার তা ছিল না, তাই তার মাঠে আর জল আসিল না। যাদের রোক নাই, তাদের কোন বস্তুই লাভ হয় না।

টাকার অহঙ্কার।

একদিন একটা মস্ত কোলা-ব্যাঙ্ বন হইতে লাফাইতে লাফাইতে লোকালয়ের দিকে যাইতেছিল, তার ইচ্ছা একবার মানুষের ঘরদুয়ার সব দেখিয়া-শুনিয়া আসিবে। তার বন্ধু ছিল এক ঘরো-ব্যাঙ্, তার কাছেই সে মানুষের বাড়ী-ঘরের অনেক কথা শুনিয়াছিল। লাফাইতে-লাফাইতে সে যাইয়া রাত্রিবেলায় এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত। ভাবিল, রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে সে সব জায়গায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিতে পারিবে। সে একটা বাক্সের নীচে লুকাইয়া রহিল।

এদিকে হইয়াছে কি, বাড়ীর কর্ত্তা একটা দরকারী কাজে তার বাক্স হইতে টাকা বাহির করিতেছিলেন, একটা টাকা হঠাৎ তার হাত হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। আলো নিয়া অনেক খোঁজা-খুঁজি করিয়াও পাওয়া গেল না; তিনি ভাবিলেন—কাল খুব ভোরে উঠিয়া ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখা যাইবে। এদিকে ব্যাঙটা শাদা চক্‌চকে' একটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইল। কিন্তু জিনিষটা যে কি তা

বুঝিতে পারিল না। পরে ঐ ঘরো-ব্যাঙকে দেখাইলে, সে বলিল—"ওহে, তোমার দেখি জোর-কপাল—আজ থেকে তোমার কপাল ফিরে গেল। এটীর নাম টাকা। এই যে মানুষের বাড়ী-ঘর—জাক-জমক সব দেখ্‌ছো, এসব এর-ই কৃপায়!" কোলা-ব্যাঙ্‌টার মনে তখন আর আনন্দ ধরে না। সে তাড়াতাড়ি টাকাটা নিয়া নিজের গর্ত্তে ফিরিয়া আসিল, আর টাকাটার খুব যত্ন করিতে লাগিল। টাকার অহঙ্কারে সে আর কাহাকেও গ্রাহ্যই করে না।

ইতিমধ্যে একদিন একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গাইয়া গেল। ব্যাঙ্‌টা বাহিরে আসিয়া খুব রাগ করিয়া হাতীকে লাথি দেখাইল, আর গাল দিতে লাগিল; বলিল,—"তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস্?" হাতীটা বুঝিল, এখন ওর টাকা হইয়াছে, নহিলে এত দিন সে উহার গর্ত্ত ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে, টুঁ-শব্দটি করে নাই, আরআজ একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি! সে কিছু না বলিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া গেল।

টাকার অহঙ্কারে লোকের লঘু-গুরু জ্ঞান থাকে না। কিন্তু মহাপুরুষেরা তাদের দেখিয়া শুধু হাসেন।

সিদ্ধাই ও ভগবান্।

একটি লোকের মনে বৈরাগ্য আসায় সে ভগবান্ লাভের জন্য সংসার ছাড়িয়া সাধু হইল। তপস্যা করিতে-করিতে সাধুটির খুব সিদ্ধাই লাভও হইল। সাধু ঐ সিদ্ধাই লইয়া মজিয়া আছে। লোকে তাহাকে খুব মানে-গণে দেখিয়া মনে বেশ অহঙ্কারও হইল। সাধুটি কিন্তু এমনি ভাল লোক ছিল।

ভগবান্ একদিন ছদ্মবেশে এক সাধু সাজিয়া আসিয়া তাহাকে বলিলেন,—"মহারাজ, শুনেছি আপনার নাকি খুব সিদ্ধাই হয়েছে, তাই আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি।" একথায় সাধুটি তাঁহাকে খুব খাতির করিল। এমন সময় একটা হাতী সেখান দিয়া যাইতেছে দেখিয়া নূতন সাধুটি বলিলেন—"আচ্ছা, মহারাজ, আপনি মনে কর্‌লে কি এই হাতীটাকে মেরে ফেল্‌তে পারেন?" সাধু বলিল— "য়্যাসা হোনে শক্তা।" (হ্যাঁ, খুব পারি)। তারপর মন্ত্র পড়িয়া ধূলা গায়ে ছড়াইয়া দিতেই হাতীটা ছট্‌ফট্ করিয়া মরিয়া গেল। নূতন সাধুটি বলিলেন—"আপনার কী শক্তি! আপনি বাহাদুর বটেন!" প্রশংসা শুনিয়া নূসাধু হাসিতে লাগিল। তন সাধুটি আবার বলিল—

"আচ্ছা, মহারাজ, এ মরা হাতীটাকে আবার বাঁচাতে পারেন কি ?" সাধু বলিল—"ওভি হোনে শক্তা হ্যায়।" (হ্যাঁ, তাও পারি)। ইহা বলিয়া আবার মন্ত্র পড়িয়া একটু ধূলা হাতীর গায়ে দিতেই হাতী ধড়্-মড়্ করিয়া বাঁচিয়া উঠিল। নূতন সাধুটি বলিলেন—"বাস্তবিকই আপনার অদ্ভুত শক্তি। কিন্তু, মহারাজ, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি যে-জন্যে বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র—সুখের সংসার ছেড়ে এলেন, এতে তার কি হলো ? এই যে জ্যান্ত-হাতী মরে গেল, আর মরা-হাতী বেঁচে উঠ্‌ল, এতে আপনার উন্নতি কি হ'ল—এতে কি ভগবান্‌কে পেলেন ? এই বলিয়া নূতন সাধুটি অন্তর্দ্ধান হইলেন। সাধুটি বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"তাইতো, সিদ্ধাই-লাভ করে আমার কি হলো ? এতেতো ভগবান্ লাভ হলো না।" এই বলিয়া সে ঐ সব ছাড়িয়া দিয়া আবার ঘোর তপস্যায় মগ্ন হইল, যাহাতে ভগবান লাভ হয়।

সিদ্ধাই লাভ ও ভগবান্ লাভ এক নয়—সিদ্ধাই লইয়া ভুলিয়া থাকিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। যারা প্রকৃত সাধু তারা সিদ্ধাই তুচ্ছ করিয়া ভগবান্‌কে চায়।

বালকের বিশ্বাস।

এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নারায়ণের নিত্য ভোগ হইত। একদিন কোন এক কাজে ব্রাহ্মণকে দূরে অন্য গ্রামে যাইতে হইল। বাড়ীতে একটি ছোট ছেলে ছাড়া আর কোনও পুরুষ ছিল না। তাই ব্রাহ্মণ যাইবার সময় ছেলেটিকে বলিয়া গেল—"ছ্যাখ্, আমি আজ সকালে ফির্‌তে পার্‌বো না। তুই আজ ঠাকুরকে ভোগ দিস্। বুঝ্‌লি তো, ঠাকুরকে খাওয়াবার ভার তোর উপর রইল।"

অন্যদিন ব্রাহ্মণ যে-সময়ে ভোগ দেয়, আজ বালকও সেই-সময়ে ঠাকুরকে ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ্ করিয়াই আছেন—কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ বসিয়া-বসিয়া দেখিল, যে, ঠাকুর আর উঠিতেছেন না। বালকের খুব সরল বিশ্বাস কিনা, তাই সে ঠিক করিয়া বসিয়া আছে, যে, ঠাকুর উঠিয়া আসিয়া আসনে বসিয়া খাইবেন। তাই সে বার-বার বলিতে লাগিল—"ঠাকুর, এসে খাও, অনেক দেরী হলো, আমি যে আর বস্‌তে পারি নে।" ঠাকুর তবুও কথা কহেন না বা নড়েন না দেখিয়া বালকের কান্না আসিল। কাঁদিয়া বলিতে

লাগিল—"ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে আমায় বলে' গেলেন—আমি তো খাওয়াতে এসেছি। তুমি কেন আস্‌বে না, কেন খাবে না ?" এরূপ কিছুক্ষণ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেই নারায়ণ হাসিতে-হাসিতে আসনে বসিয়া খাইতে লাগিলেন।

খাওয়া শেষ হইলে, বালক যখন ঠাকুর-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন বাড়ীর সকলে বলিল,—"কিরে, ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হলো ? ভোগটা সব নামিয়ে নিয়ে আয়।" ছেলেটি বলিল—"হ্যাঁ, হয়ে গেছে, ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন।"

সকলে বলিল—"সে কিরে !" ছেলেটি বলিল—"হ্যা, তাইতো, ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন।" তখন সবাই মিলিয়া ঠাকুর-ঘরে যাইয়া সেখানকার ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ !

বালকের মত সরল বিশ্বাসে ব্যাকুল হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেই ভগবান্ দেখা দেন।

"মন্দিরে তোর নাহিক মাধব।"

পদ্মলোচন ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু লেখাপড়া কিছু শিখে নাই। শুধু গ্রামের পুকুর হইতে মাছ ধরে, আর রাখালদের সঙ্গে খেলিয়া বেড়ায়। ছেলেটি খুব সরল, তাই সকলে খুব ভালবাসে। গ্রামের লোক তাকে "পদো" "পদো" বলিয়া ডাকিত।

গ্রামের এক কোণে খুব নির্জ্জন স্থানে একটি মন্দির ছিল। মন্দিরটি খুবই জীর্ণ—তার উপর কত গাছ হইয়াছে, কত লতা জড়াইয়া রহিয়াছে। সামনের পুকুরটি পানায় ভরিয়া গিয়াছে। গ্রামের কোনও লোক ঐ-দিকে বড় যাইত না।

একদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের লোক শুনিতে পাইল, ঐ পড়ো'-মন্দিরে কে যেন শাঁক ফুঁকিতেছে ও ঘণ্টা বাজাইতেছে। সকলে মনে করিল, কেহ বা বুঝি ঐ প্রাচীন মন্দিরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া সন্ধ্যায় আরতি করিতেছে। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, সকলে দৌড়াইয়া মন্দিরের কাছে গেল—ইচ্ছা, ঠাকুর দর্শন করিবে ও আরতি দেখিবে।

মন্দিরের দুয়ার বন্ধ দেখিয়া একজন লোক আস্তে-আস্তে দরজা ঠেলিতে লাগিল। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। দরজা ফাঁক হইলে সকলে অবাক্ হইয়া দেখিল, মন্দিরে কোনও ঠাকুর নাই—পদ্মলোচন সেখানে একা দাঁড়াইয়া ভোঁ-ভোঁ করিয়া শাঁক বাজাইতেছে। মন্দির যেমন ছিল, তেমনই আছে। ঘর ভরিয়া চাম্‌চিকার বিষ্ঠা ও ময়লা জমিয়া আছে। চারিদিকে আবর্জ্জনা—দুর্গন্ধে প্রাণ যায়! বিগ্রহ-শূন্য সেই মন্দিরে পদ্মলোচন শাঁক ফুঁকিয়া এক গোল বাঁধাইয়াছে। তখন এক ব্যক্তি চেঁচাইয়া বলিল—

"মন্দিরে তোর নাহিক মাধব,
পোদো শাঁক ফুঁকে তুই কর্‌লি গোল।"

এমন অনেক লোক আছে, যাদের ভিতরে কোনও সার বস্তু নাই—শুধু বাইরের জাঁক-জমক দেখায়, বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়—তাহাদের দ্বারা কোনও কাজ হয় না, বরং কেবল গোলমালেরই সৃষ্টি হয়।

"যাঃ শালা ঘর।"

একজন লোক নিজের ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া নিরিবিলি থাকিবার জন্য এক পাহাড়ে চলিয়া গেল। সেখানে বাঁশ-খড় ইত্যাদি যোগাড় করিয়া বাস করিবার জন্য একখানা ছোট্ট কুঁড়ে তৈয়ারী করিল। শীতকালটা তার সে কুঁড়ে-ঘরে বেশ কাটিয়া গেল। কিন্তু ক্রমে ঝড়-বৃষ্টির দিন আসিয়া পড়ায় সে ভারী মুস্কিলে পড়িল, কারণ একটু সামান্য বাতাস বহিলেই ঘর ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে।

একদিন বিকাল বেলা মেঘ করিয়া ভয়ানক ঝড় আসিল, কুঁড়ে-ঘর টলমল্ করিতে লাগিল। কি করিয়া ঘরখানা বাঁচান যায় তার জন্যে সে ভারী চিন্তিত হইয়া পড়িল। তখন সে কাতর হইয়া বলিতে লাগিল—"হে পবনদেব, দেখো যেন ঘরখানা ভেঙ্গোনা, বাবা!" পবনদেব কিন্তু শুনিলেন না—ঘর মড়্মড়্ করিতে লাগিল। তখন লোকটী আর কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"হনুমানের ঘর, বাবা, হনুমানের ঘর, এটা ভেঙ্গো না।" কারণ সে জানিত যে

হনুমান্ পবনের ছেলে ; নিজের ছেলের ঘর কেউ ভাঙ্গে না। তাতেও কিন্তু ঘর মড়্-মড়্ করিতেই লাগিল। তখন সে "লক্ষ্মণের ঘর—লক্ষ্মণের ঘর" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। ঘর কিন্তু ক্রমে ভাঙ্গিতেই লাগিল। তখন আরো জোরে চীৎকার করিয়া সে বলিতে লাগিল,—"বাবা ! এ রামের ঘর—রামের ঘর। দেখো, বাবা, ভেঙ্গো না, দোহাই তোমার।" তাতেও কিছু হইল না দেখিয়া সে ভাবিল, যদি সে ঘরের মায়া করিয়া ঘরে বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাকে ঘর চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে। তখন সে "যাঃ শালা ঘর!" বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এগিয়ে পড়।

এক ছিল কাঠুরে। ভয়ানক গরীব সে। রোজ-রোজ বন হইতে কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করে। তাহাতে যা-কিছু পায় তাহা দিয়াই কোনরকমে কষ্টে-স্মৃষ্টে তার সংসার চলে। একদিন সে প্রত্যেক দিনের মত বনে কাঠ কাটিতে গিয়াছে, হঠাৎ এক সাধুর সঙ্গে দেখা। সাধুকে দেখিয়াই সে তার হাতের কুড়ুল মাটিতে রাখিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিল। সাধু তার ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়া খুসী হইয়া বলিলেন,—"ওহে, এগিয়ে পড়।" এই কথা বলিয়াই সাধু আর অপেক্ষা না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কাঠুরেও তখন কুড়ুল হাতে লইয়া নিজের কাজে লাগিয়া গেল; সাধুর কথার অর্থের জন্য মাথা ঘামাইল না।

আরো কিছুদিন গেল; কাঠুরের সংসারের অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হইতে লাগিল। আগে বনে বড়-বড় গাছ মিলিত, তাহা বিক্রয় করিয়া তবু যাহোক দু'পয়সা পাইত। এখন বড়-গাছ প্রায়ই ফুরাইয়া গিয়াছিল, চারা-গাছ বিক্রয় করিয়া তেমন পয়সা পাওয়া যায় না। অথচ

ঘরে পোষ্যের সংখ্যা দিন-দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কি করিবে, কাঠুরে ভাবিয়া আর কুল পায় না। হঠাৎ একদিন সাধুর কথা মনে পড়িয়া গেল; ভাবিল,—"সাধু আমায় এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, একবার এগিয়ে গিয়েই দেখিনা ব্যাপার কি হয়।"

এই মনে করিয়া পরদিন সে, রোজ যেখানে কাঠ কাটিত, সেখান হইতে একটু অগ্রসর হইল। একটু গিয়াই দেখে রাশি-রাশি চন্দনের গাছ! তার মনে ভারী আনন্দ হইল—মোটা-মোটা দেখিয়া যতদূর পারিল, কাটিয়া নিয়া, বাজারে বিক্রয় করিয়া, অন্যদিনের চেয়ে ঢের বেশী টাকা পাইল; তার আর খাওয়া-পরার কোন কষ্ট রহিল না। এরকমে কিছুদিন গেল। একদিন সে মনে ভাবিল,—"আচ্ছা আর একটু এগিয়ে দেখা যাক্ না।" এই মনে ভাবিয়া সে আরো একটু এগিয়ে গেল। দেখে, নদীর ধারে কেবল রূপার খনি! দেখিয়া তো তার তাক্ লাগিয়া গেল। এত রূপা এখানে পড়িয়া, আর সে কাঠের বোঝা বহিয়া মরিতেছে! সাধুর কথা-মত এগিয়ে গেলেতো কোন্‌দিন সে রাজা হইয়া বসিতে পারিত! রাশি-রাশি রূপা আনিয়া সে বাড়ী ভরিয়া ফেলিল।

কিছুদিন পরে তার মনে হইল,—"আচ্ছা, সাধুতো

আমায় রূপোর খনি পর্য্যন্তই যেতে বলেন নি। আর একটু এগিয়ে দেখিনা সেখানে কি আছে?” এই মনে করিয়া সে রূপার খনি ছাড়াইয়া আরো অগ্রসর হইল। একটু এগিয়েই দেখে, সম্মুখে বিস্তর সোনার খনি—যতদূর দেখা যায় কেবলি সোনা! তখন তার আনন্দ দেখে কে! আনন্দে সে নাচিতে লাগিল।

কিন্তু সোনার খনিতেও তাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না; এগিয়ে যাওয়ার আস্বাদ পাইয়া সে কেবল এগিয়েই যাইতে লাগিল। যাইতে-যাইতে অনেক মূল্যবান্ ধাতুর খনি পার হইয়া এমন জায়গায় গিয়া পৌঁছিল, যেখানে হিমালয়ের মত মণি-মুক্তা-হীরার পাহাড়—জন্ম-জন্ম খরচ করিলেও তা ফুরাইবার নয়! তখন সে দেবতাদের ধনরক্ষক কুবেরের মত ধনী হইয়া গেল!

যা-ই করা যাক্‌না কেন, সামান্য একটু সফলতা লাভ করিয়াই থামিয়া যাওয়া উচিত নয়; যত অগ্রসর হইবে ততই ভাল ফল লাভ করিবে। ভগবান্ লাভ করিতে হইলেও একটু সিদ্ধাই দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না, তাহা তুচ্ছ করিয়া আরো অগ্রসর হইতে হইবে, তবে ভগবানের দর্শন মিলিবে।

উপদেশ ও দৃষ্টান্ত

এক গ্রামে একজন নামজাদা কবিরাজ বাস করিতেন। আশে-পাশে দেশ ভরিয়া তাঁর সুখ্যাতি—তিনি যার চিকিৎসার ভার নেন, মরণ নাকি তার কাছেও ঘেঁসিতে পারে না। তাই অনেক দূর-দেশ হইতেও অনেক রোগী চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে আসিত। তিনিও অত্যন্ত যত্নের সহিত তাহাদের চিকিৎসা করিতেন।

একদিন অনেক দূর-দেশ হইতে এক রোগী চিকিৎসার জন্য তাঁহার নিকট আসিল। কবিরাজ রোগ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, অধিক পরিমাণে মিষ্টি খাওয়াতেই ইহার এই রোগ জন্মিয়াছে; এখন কিছুদিন মিষ্টদ্রব্য না খাইলেই ইহার রোগ সারিয়া যাইবে, এর জন্য আর অন্য ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন নাই। একথা বলিতে যাইতেই দেখিতে পাইলেন যে, সে-ঘরে কতকগুলি গুড়ের হাঁড়ি সাজান রহিয়াছে। তিনি রোগীকে এ-কথা না বলিয়া পরদিন আসিয়া ঔষধ নিয়া যাইতে বলিয়া দিলেন। এত বড় একজন কবিরাজ যখন দেখামাত্র ঔষধ ঠিক করিতে পারিলেন না, তখন ব্যারাম নিশ্চয়ই গুরুতর, এই

মনে করিয়া রোগী চিন্তিত-মনে চলিয়া গেল। রোগী চলিয়া যাইতেই তিনি গুড়ের হাঁড়িগুলি অন্য ঘরে সরাইয়া ফেলিলেন।

পরদিন রোগী আসিয়া উপস্থিত। কবিরাজ বলিলেন,—"দেখ, তোমার এ রোগের জন্য ঔষধের কোন প্রয়োজনই নাই, শুধু মিষ্টদ্রব্য খাওয়া ছাড়্‌লেই ইহা সেরে যাবে।" রোগী চলিয়া গেলে, একজন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"একথা তো কালই বল্‌তে পার্‌তেন, তার জন্য আজ একে আবার এতদূর আনাবার কি দরকার ছিল?"

কবিরাজ একটু মুচ্‌কী-হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"মশায়, কাল যে বলি নাই তার কারণ ছিল। কাল আমার এ-ঘরে কতকগুলো গুড়ের হাঁড়ি ছিল। কাল আমি একে একথা বল্‌লে, সে ভাব্‌তো যে, এর নিজের ঘরে এত গুড় আর অন্যকে বল্‌ছে—গুড় খেয়ো না, খেলে অসুখ কর্‌বে! সে আমার কথা মোটেই বিশ্বাস কর্‌তো না। তাই আজ গুড়ের হাঁড়ি সরিয়ে একথা বল্‌লাম।"

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অনেক ভাল। যিনি উপদেশ দেন, তিনি সেই মত কাজ করিয়া না দেখাইলে, তাঁহার উপদেশ কেহ গ্রাহ্য করে না।

হাতী কেমন ?

একদিন কতকগুলি অন্ধ এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তাহারা যাইতে-যাইতে একটা হাতীর কাছে গিয়া পড়িল। মাহুতটী তাহাদের সাবধান করিবার জন্য বলিল,—“ওহে, সরে’ যাও—সরে’ যাও, হাতী যাচ্ছে—হাতীর পায়ের নীচে পড়ে’ মারা যাবে।” অন্ধরা হাতীর নামই শুনিয়াছে, কিন্তু জন্তুটা কেমন তাহা জানে না। তাই তাহাদের হাতী কেমন দেখিবার সাধ হইল। অন্ধরা চক্ষুদ্বারা দেখিতে না পাইলেও কেবল মাত্র হাত দিয়া ছুঁইয়া অনেক বিষয় বুঝিতে পারে। তাই তাহারা মাহুতকে অনুরোধ করিল—“ও ভাই, তোমার হাতীটি একবার থামাও না, উহা কেমন আমরা একবার দেখিয়া লই।” মজা দেখিবার জন্য মাহুত হাতীটি থামাইল। তখন উহারা হাতরাইয়া-হাতরাইয়া হাতী দেখিতে লাগিল। তারপর উহারা আবার পথ চলিতে লাগিল; সঙ্গে-সঙ্গে হাতীর গল্পও হইতে লাগিল। একজন বলিল—“ওঃ, হাতীটা কী প্রকাণ্ড—যেন একটা থামের মত!” আর একজন বলিল—“না হে, উহা একটা কুলোর মত।” অন্য

এক-জন বাধা দিয়া বলিল—"না-না, উহা একটা মস্ত জোঁকের মত।" আর এক অন্ধ বলিয়া উঠিল—'না, হে, না, তোমরা কেউ ওটাকে বুঝ্‌তে পার নাই—উহা থামের মতও নয়, কুলোর মতও নয়, জোঁকের মতও নয়—উহা একটা মস্ত জালার মত!"

তখন ইহা লইয়া মহা ঝগড়া আরম্ভ হইল। সকলেই বলে "আমি নিজে দেখেছি অন্য রকম হতেই পারে না"। ঝগড়া ক্রমে মারামারি হইবার উপক্রম। সেখান দিয়া একজন পথিক যাইতেছিল। সে উহাদের ঝগড়ার কারণ জানিতে পারিয়া বলিল,—"ওহে, তোমরা ঝগড়া করো না, আমার কথা শোন। তোমাদের কারুর কথাই একেবারে ঠিক নয়। তোমরা হাতীর এক-একটা অংশ দেখেই এ-রকম ঝগড়া কচ্ছো। হাতী থামের মতও নয়, কুলোর মতও নয়, জোঁকের মতও নয়, কিম্বা জালার মতও নয়। উহার পা থামের মত, কাণ কুলোর মত, শুঁড় জোঁকের মত, আর পেট জালার মত। এ সবগুলো একত্র করলে যা হয় তা-ই হচ্ছে হাতী।"

মানুষ ভগবানের এক-একটা দিক দেখিয়া ভাবে, ভগবান এই রকমই—অন্যরূপ হইতে পারেন না। তাই নানা ধর্ম্মে এত বিরোধ।

স্যাঁকরার দোকান।

এক সেঁকরার একখানা দোকান ছিল। নানারকম সোনা-রূপার জিনিস সেখানে তৈয়ার হইত। সেঁকরা ভারী ভক্ত। গায়ে নামাবলী, গলায় মালা, কপালে তিলক—মুখে সর্ব্বদা ভগবানের নাম। তার যে আরও কয়েকটি কারিগর আছে, তারাও এর মতই খুব ভক্ত।

সাধারণতঃ লোকে সেঁকরার কাছে জিনিস তৈয়ার করিতে দিতে বড় ভয় পায়। কারণ উহাদের মধ্যে কেহ-কেহ সোণা চুরি করিয়া তাহাতে ভুঁয়া জিনিস এমন করিয়া মিশাইয়া দেয়, যে লোকে সহজে ধরিতে পারে না। কাজেই লোকে বিশ্বাসী সেঁকরার দোকান খোঁজে। এই সেঁকরার এরূপ ধর্ম্মভাব দেখিয়া তাহার প্রতি লোকের বিশ্বাস খুব বাড়িয়া গেল—খরিদ্দারের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

খরিদ্দার দোকানে আসিলেই একজন বলিয়া উঠিত—"কেশব—কেশব"। একটু পরেই আর একজন বলিত—"গোপাল—গোপাল"। তখন আর একজন বলিত—"হরি—হরি"। অপর জন বলিত—"হর—হর"।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরা যে ভগবানের নামই করিত তা নয়, এর মধ্যে তাদের খারাপ মতলব ছিল। খরিদ্দার দোকানে আসিলে যে "কে-সব—কে-সব" বলিত, তাহার অর্থ এই যে,—"এরা সব কে ?" খরিদ্দারটি যদি দেখিতে একটু বোকা-বোকা হয়, তবে অপর জন বলিত যে "এরা গো-পাল—গো-পাল," অর্থাৎ এরা সব গরুর দল—বোকা। তখন তৃতীয় জন বলিত, তবে "হরি—হরি"। হরি শব্দের এক অর্থ চুরি করা ; এর কথার অর্থ এই, যে এ যখন বোকা, তখন এর জিনিস হইতে সোণা চুরি করা যাক্—এ ধরিতে পারিবে না। তখন অপর ব্যক্তি ইহার উত্তর স্বরূপ বলিত—"হর—হর" অর্থাৎ তাহা হইলে চুরি কর।

বোকা খরিদ্দারেরা উহাদের খারাপ মতলব টের না পাইয়া উহারা ভক্ত,—ভগবানের নামই করিতেছে মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের নিকট জিনিস তৈয়ার করিতে দিত। উহারাও নির্ভয়ে বোকাদের ঠকাইতে লাগিল।

এমন অনেক ভণ্ড-সাধু আছে যারা বাহিরে খুব ত্যাগের ভাব দেখায়, কিন্তু ভিতরে তাদের খারাপ মতলব। এদের কাছে সাবধান হইতে হয়।

কর্ত্তা কে ?

এক ব্রাহ্মণের একখানা অতি সুন্দর বাগান ছিল। ব্রাহ্মণ নিজ-হাতে বাগান পরিস্কার, জল সেচন ইত্যাদি কাজ করিত। বাগানটী ব্রাহ্মণের অতি প্রিয় ছিল।

একদিন একটা গরু কোনও সুযোগে বাগানে ঢুকিয়া বাগানের গাছ-গাছড়া সব নষ্ট করিয়া ফেলিল। টের পাইয়া ব্রাহ্মণ দৌড়াইয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, তাহার সাধের গোলাপ গাছ মাটিতে পড়িয়া, রজনীগন্ধার কোন সন্ধানই নাই, অপরাজিতা গরুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত—তাহার কুঞ্জবন ছাড়েখাড়ে গিয়াছে! দেখিয়া ব্রাহ্মণতো চটিয়া লাল। এমন সাধের জিনিস এমন করিয়া নষ্ট হইলে কার না রাগ হয়? ব্রাহ্মণ রাগের মাথায় একটা বাঁশ তুলিয়া লইয়া গরুটাকে এমনি করিয়া মারিল, যে সেটা একেবারে মরিয়াই গেল।

গরুটা মরিয়া যাইতেই, গোহত্যার পাপ ভয়ানক মূর্ত্তি ধরিয়া ব্রাহ্মণকে ধরিতে আসিল। গোহত্যার পাপের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য ব্রাহ্মণ এক ফন্দী করিল; বলিল,—"দেখ, এ হত্যা আমি করি নাই—ভগবানই করিয়েছেন। এই সংসারে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা, আমাদের দ্বারা তিনি

তাঁর কাজ করিয়ে নেন মাত্র। অতএব, এ হত্যায় যদি পাপ হয়ে থাকে, তবে তা ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়েছে—তার জন্য তিনিই দায়ী।" গোহত্যার পাপ গিয়া ভগবানকে ব্রাহ্মণের কথা জানাইল। সমস্ত শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন, —"বটে? চলতো আমার সঙ্গে।"

মানুষের রূপ ধরিয়া ভগবান ব্রাহ্মণের বাগানে আসিলেন। বাগানখানার অনেক প্রশংসা করিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায় বল্‌তে পারেন এ বাগানখানা কার?"

ব্রাহ্মণ খুব খুসী হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, এখানা আমার। আমি নিজ-হাতে এই বাগান তৈরী করেছি।"

ভগবান্ বলিলেন—"বটে? ঐ সুন্দর পুকুরটাও বুঝি আপনার?—কেমন সুন্দর টলটলে' জল!"

ব্রাহ্মণ মহাখুসী হইয়া বলিল—"আজ্ঞে, হাঁ, এ সব-ই আমার। ঐ যে দেখ্‌ছেন বাড়ী, কুঞ্জবন, মন্দির—সবই আমি করেছি।"

ভগবান্ বলিলেন—"বটে, সব-ই তুমি নিজে করেছ, আর গোহত্যার বেলা ভগবান্ তোমাকে দিয়ে করিয়েছেন! —যাও, গোহত্যার পাপ, তুমি এর শরীরে আশ্রয় লও।" গোহত্যার পাপ ব্রাহ্মণকে চাপিয়া ধরিল।

বর্ত্তমান যুগের উপযোগী

আর একখানা বই :—

বিবেক-মন্ত্র ।

বিশ্ব-বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপনাময়ী বাণী

অভিনব ভাবে লিখিত—যুবকগণের প্রকৃত

মনুষ্যত্ব লাভের একান্ত সহায় ।